বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টা

শেখর শীল

"চিন্তাভাবনা করার এবং কাজ করার যে আদর্শ বঙ্গে বৈষ্ণব আন্দোলনের স্রষ্টাগণ ষোড়শ শতকে স্থাপন করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে অনুসৃত হয় নি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বঙ্গ সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ছিল না। ...বঙ্গে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল।"[২৪] লিখছেন রমাকান্ত চক্রবর্তী। আসলে ইংরেজ শাসনের সূত্র ধরেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাঙালি সমাজে এমন কিছু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়, যা কালক্রমে বাঙালি জাতির পরিচয়কে নতুনভাবে নির্মাণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজ এক নতুন দিশা অর্জন করেছিল, তাঁরা অবশ্যই বাঙালি মনীষার জগতে চিরস্মরণীয়। কিন্তু এই সকল চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে যখনই কোনো যুক্তিভিত্তিক সবিচার বিশ্লেষণের প্রশ্ন আসে, তখন এক অদ্ভুত এবং বেশ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। আসলে এই মনীষীদের সামাজিক ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের এমন স্তরে উন্নীত করা হয়, গজদন্ত মিনারে এমনভাবে তাঁদের বসানো হয় যে তাঁদেরকে তখন দেবতা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা বিশেষভাবে অসম্ভব মনে হয়। এর ফল হয় যে তাদের নিয়ে যুক্তিভিত্তিক আলোচনার কোনো পরিসর বা পরিমণ্ডল অবশিষ্ট থাকে না। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ফেলে তাদের ভূমিকার বিশ্লেষণ তাঁদের প্রতি অসম্মানের সূচক বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই তো কালের অধীন। আমরা যে কাজ বা যে ভূমিকাই পালন করি না কেন সময়ের ছাপ, তার সীমাবদ্ধতা আমাদের উপর তো পড়েই। তাকে তো আমরা কোনোভাবে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি না। তার মুখোমুখি তো আমাদের দাঁড়াতেই হয়, এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা এবং চিন্তা সময়ের নিরিখে পুনর্বিবেচনার দাবি করে।

যে কোনো সামাজিক পরিবর্তনের কর্মসূচি তার সময় এবং পরিপার্শ্বিকতার মূল ভাষ্যকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারে না, সেটা যদি হয়ও, তার যাত্রাপথ খুব কমই সাফল্যের আস্বাদ পায়। অথচ প্রথিতযশা ব্যক্তিদের ওপর দেবত্ব আরোপের ঘটনা এই ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করতে চায়। ফলে তাঁদের ভূমিকার যথাযথ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের যে জটাজাল তাঁদেরকে বিস্তার করেছিল তা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। উনিশ শতকের অন্যান্য চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের মতো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রযোজ্য। তিনি "স্বয়ং ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ"[২৫]— এই ধরনের মন্তব্য নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরের ওপর দেবত্ব আরোপ-এর একটি বিশেষ উদাহরণ। বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালে। এই অর্থে ২০১৯ সাল হলো বিদ্যাসাগরের ২০০তম জন্ম বছর এবং আমরা সাড়ম্বরে তাঁর এই ২০০তম জন্মবার্ষিকী পালন করছি। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এখন বোধহয় সময় এসেছে দেবত্বের ঘেরাটোপ থেকে বিদ্যাসাগরকে মুক্ত করে তাঁর সময় এবং সামাজিক অবস্থানের নিরিখে তাঁর ভূমিকাকে হাজির করা। এর অর্থ কখনোই এমন নয় যে তাঁর কৃতিত্বকে কোনোভাবে হেয় বা অসম্মান করা। একভাবে তাঁর ভূমিকার একটি ঐতিহাসিক এবং বস্তুগত বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়েই আমরা সঠিক অর্থে তাঁর ভূমিকাকে হয়ত স্মরণ করতে পারব। কে বলতে পারে, দুশ' বছরের জন্ম উৎসবের প্রাক্কালে তিনি নিজেও এমনটাই চাইছেন না!

---

[২৪] চক্রবর্তী, রমাকান্ত (২০০০), 'তিন সংস্কারক (রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ)', বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ (সম্পাদিত), উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, পৃ. ১৫৯

[২৫] বসু, স্বপন (১৯৯৩), সমকালে বিদ্যাসাগর, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, পৃ. ৩৮

১.

কোনো সন্দেহ নেই যে বিধবাবিবাহ বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত, যাকে স্বয়ং বিদ্যাসাগর নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রচেষ্টা বলে মনে করতেন। কিন্তু বিধবাবিবাহ আন্দোলনসংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়টি প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় তা হলো, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর আধুনিকতার প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ অবস্থানকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আধুনিকতার ভাষ্যে মূল আলোচ্য হলো ব্যক্তি ও তার স্বাতন্ত্র্য। সমস্ত ধরনের অন্য পরিচয়, আনুগত্যকে পাশ কাটিয়ে তাকে পেছনে ফেলে আধুনিকতা ব্যক্তিকেই তুলে ধরেছে সমস্ত কিছুর মানদণ্ডরূপে। সুরক্ষিত করতে চেয়েছে তার অধিকার এবং সমাজে তার অবস্থানকে। আধুনিকতার এই নির্যাসকেই বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কতটা সফল বা ব্যর্থ হয়েছিলেন সে প্রশ্ন ভিন্ন। একভাবে শিক্ষা সংস্কার থেকে বিবাহ সংস্কার এই প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার পেছনে আধুনিক ব্যক্তির যে ধারণা, তার বিবিধ প্রতিফলন বিদ্যাসাগরের মধ্যে দেখা যায়।[২৭] বলা বাহুল্য যে, তৎকালীন উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে সমস্ত ধরনের সামাজিক চাপ ও সংস্কারকে পেছনে ফেলে ব্যক্তির স্বকীয়তা, স্বাধীন মতামত, নিজ জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়কে বিদ্যাসাগর যেভাবে মূল্য প্রদান করেছেন, অনেক সময়ই তা আলোচনার পরিসর থেকে বাদ পড়ে যায়।

কোনো সন্দেহ নেই যে বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টার কেন্দ্রে ছিল নারী। তাঁর সমস্ত সংস্কার প্রচেষ্টা নারীপ্রশ্নকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আধুনিক সমাজকে তিনি তাঁর ভাবনায় জারিত করতে চেয়েছিলেন, সেখানে নারী ছিল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অর্থাৎ নারীকে তিনি ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর এই ভাবনার বলিষ্ঠ উপাদান তাঁর সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর নিরিখে শুধু এ দেশের ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিকভাবেই তাঁর এই ভাবনা বৈপ্লবিক, কেননা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পীঠস্থান ইউরোপও তখনো পর্যন্ত নারীকে ব্যক্তিরূপে মর্যাদা দেওয়ার কথা ভেবে উঠতে পারে নি। সেখানে তখনো ব্যক্তির ভাবনা পুরুষের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

এখন বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীকে ব্যক্তিরূপে দেখার বিষয়টি কীভাবে প্রতিফলিত হয়? এই বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই বিধবাবিবাহসংক্রান্ত বিদ্যাসাগরের যে রচনা, বিশেষ করে, তাঁর গ্রন্থ 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর দিকে নজর দিতে হবে। তিনি লিখছেন–

"দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা যাহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবে।"[২৮]

উল্লিখিত অংশটি যদি একটু গভীরভাবে পড়ি তাহলে যে বিষয়টি ক্রমে আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো যে তিনি একদিক থেকে একজন ব্যক্তিরূপে নারীর যে যৌন অধিকার তাকে স্বীকৃতি

[২৭] চক্রবর্তী, রমাকান্ত (২০০৩), 'তিন সংস্কারক (রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ)', পৃ. ১৭১

[২৮] বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড), (১৯৭২), কলকাতা, পৃ. ৩২-৩৩

দিচ্ছেন। যদিও সেই সময়ের পরিস্থিতিসাপেক্ষে তাঁর পক্ষে খুব সোচ্চারভাবে এই বিষয়ে বলা হয়ত সম্ভব ছিল না। কিন্তু পরোক্ষভাবে তিনি যে কথাগুলো এখানে বলেছেন তা থেকে এটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে কোথাও বিধবাবিবাহ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর পুরুষের মতোই নারীর যৌন অধিকারের বিষয়টিকে ছুঁতে চেয়েছেন। বিধবাবিবাহের মতো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীর যৌন অধিকারের মতো বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি না সেটা ভিন্নতর বিতর্কের বিষয়। কিন্তু বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নারীর যৌনতা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছিল, বিদ্যাসাগরের লেখার মধ্য দিয়ে সেটা বেশ ভালোভাবেই প্রতিপন্ন হয়। বিধবাবিবাহ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নারীকে ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরার সব থেকে বৈপ্লবিক দিকটি হলো যে এই আন্দোলন এবং তাঁর বৈধকরণের মধ্য দিয়ে অন্তত ধারণাগত স্তরে সতীত্বের যে মূল্যবোধ, তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সাধারণভাবে 'সতীত্ব' বা এক পুরুষের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রায় সকল সমাজেই একটি স্বীকৃত মূল্যবোধরূপে নারীর ওপর আরোপ করা হতো এবং এখনো হয়। কিন্তু ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এই মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত ছিল নারীর পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন, স্বর্গপ্রাপ্তির ধারণা। ফলে অন্যান্য সমাজব্যবস্থার নিরিখে ভারতীয় সমাজে সতীত্বের প্রসঙ্গটি ছিল বেশ জটিল এবং গভীরে প্রথিত। বিদ্যাসাগর যখন বিধবাদের জন্য পুনর্বিবাহের প্রস্তাব করলেন, তখন এক স্বামী বা পুরুষের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকার বিষয়টি আর প্রাসঙ্গিক থাকল না। অর্থাৎ সতীত্ব নামক সামাজিক মূল্যবোধের দাবি থেকে তাঁর মুক্তি ঘটল।[৯] একজন ব্যক্তি হিসেবে সে যদি মনে করে যে স্বামী হারানোর পরে সে দ্বিতীয়বার কোনো অপর পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবে সে তা স্বাধীনভাবেই করতে সমর্থ। ১৮৫৬ সালে যখন বিধবাবিবাহ আইনে পরিণত হয়, সেই আইন উপর্যুক্ত এই দুটি ধারণারই পরোক্ষ স্বীকৃতি।

২.

সন্দেহ নেই যে বিদ্যাসাগর চর্চায় এই প্রসঙ্গগুলোর আলোচনা আরও বেশি করা দরকার। বিধবাবিবাহসংক্রান্ত আলোচনায় এই দিকগুলোই বোধহয় তাঁর ভাবনাচিন্তার চূড়ান্ত বৈপ্লবিক দিকের ইঙ্গিতবাহী, যার ওপর দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের বাংলায় এক নতুন সমাজভাবনাকে হাজির করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অপরপক্ষে বিধবাবিবাহ একটি সামাজিক আন্দোলন, চিন্তা ও ধারণাগত পরিসরের বাইরে, যার ব্যাপ্তি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সমকালীন সমাজে বিধবাবিবাহ আন্দোলন এমন আলোড়ন তৈরি করেছিল, যাকে নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো বিধবাবিবাহসংক্রান্ত সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ? অন্যভাবে বললে, আন্দোলনের প্রধানতম চালিকাশক্তি হিসেবে বিদ্যাসাগর কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সেটা কী অর্থে গুরুত্বপূর্ণ? ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ তাঁর বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেইজন্য ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে সম্মতিসূচক ব্যবস্থা আদায় করেছিলেন। কিন্তু সে সময় ব্রাহ্মণ স্মার্তদের প্রাচীনতম কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ এবং রাজবল্লভের মনে হয়েছিল যে সেখানকার পণ্ডিতদের মতামত এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলির কাছে অনুমতিসূচক ব্যবস্থা চাইলেন। সে সময় নদীয়ার সিংহাসনে আসীন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, যিনি ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয়। তাঁর প্ররোচনায় এবং আদেশে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলি রাজবল্লভের এই উদ্যোগকে অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করলেন। এমনকি ব্যাপারটি যে হিন্দুদের সামাজিক আচরণের বিরোধী, একথাও বলা হলো। ফলে রাজবল্লভের পক্ষে সামাজিক চাপকে উপেক্ষা করে আপন বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দেওয়া সম্ভব হলো

[৯] সরকার, সুমিত (১৯৯৮), রাইটিং সোসাল হিস্ট্রি, অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, নিউ দিল্লি, পৃ. ১৫০

না।[৩০] যদি সেই অষ্টাদশ শতকেই রাজবল্লভ এই কাজে সফল হতেন, তাহলে আর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হতো না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী যে সময়ে বিধবাবিবাহের প্রস্তাব নিয়ে বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হন, তার অনেক আগে থেকেই, বস্তুত এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই বিষয়ে বাঙালি সমাজে চিন্তাভাবনা, বিতর্কের পরিসর গড়ে ওঠে। বিরোধিতার পাশাপাশি বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিরোধী নয়, শাস্ত্রানুমোদিত, অনেক শাস্ত্রকারই অন্তত তাত্ত্বিক স্তরে এমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞের উল্লেখ করা যায়, যাঁরা সক্রিয়ভাবে এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা হলেন ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। এই তিনজনের মধ্যে প্রথম দুজন শাস্ত্রের নিরিখে বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করে এক ব্যবস্থাপত্র দেন, যা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরূপে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ স্বহস্তে লেখেন। তৃতীয়জন নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহের কঠোর সমালোচক। ১৮৫৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে আহুত এক সভায় প্রায় ২০০ জন পণ্ডিতের উপস্থিতিতে এই ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিচারে ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহের পক্ষে সমর্থন করে জয়ী হন। সিদ্ধান্ত হয় এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল অপ্রচলিত হলেও শাস্ত্রসম্মত।[৩১] উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে মোটামুটিভাবে বিধবাবিবাহসংক্রান্ত যে সচেতনতা দেখা যায়, তার উপর ভিত্তি করেই ১৮৪২ সালে ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর প্রথম সংখ্যাতেই প্রশ্ন তোলা হয়– "পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহকরণে সক্ষমা না হয়।"[৩২]

১৮৪৯ সালের ২৮ এপ্রিল 'সম্বাদ ভাস্কর' জানায়, হিন্দু বিধবাদের বিবাহ নিয়ে যুবকদের মধ্যে নানারকম আলোচনা চলছে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুরা এ-বিষয়ে কঠোর। ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস মনে করতেন, বিধবার বিয়ে প্রচলিত হবেই। তিনি প্রাচীন হিন্দুদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন– "প্রাচীন হিন্দু মহাশয়েরা এই সময়ে শাস্ত্রীয় প্রথানুসারে নিয়মবদ্ধ করিয়া যদি বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত করেন তবে তাঁহারদিগের বংশাবলীকে উত্তরকালীন আপদ হইতে মুক্ত রাখিয়া যাইবেন।"[৩৩]

বলা বাহুল্য যে, এই সকল ঘটনা যখন ঘটছে, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর পরিকল্পিত বিধবাবিবাহ আন্দোলন থেকে বহু দূরে। ঘটনার রঙ্গমঞ্চে তিনি তখনো অনুপস্থিত। এমনকি যে পরাশর সংহিতার বিশেষ একটি শ্লোকের উপর ভিত্তি করে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, সেটিও আবিষ্কার করেছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য, ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যরা।[৩৪] যদিও ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যরা কোনোরকম শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুসরণ না করে মানবিক অধিকার ও নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে বিধবাবিবাহের বিষয়কে সমর্থন করেছিলেন, ফলে তাঁরা পরাশর সংহিতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কোনোরকম আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এ ক্ষেত্রে ডিরোজিয়ানদের মতো করে বিধবাবিবাহ আন্দোলন শাস্ত্রভিত্তিক না হয়ে যদি সমানাধিকার ও মানবিক আবেদনের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতে পারত, তাহলে এই

[৩০] বসু, নিমাই সাধন (১৯৬৩), ইন্ডিয়া অ্যাওয়েকেনিং অ্যান্ড বেঙ্গল, ফার্মা. কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ২৯

[৩১] বসু, স্বপন (২০০০), বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৩৫

[৩২] বসু, স্বপন (১৯৯৩), সমকালে বিদ্যাসাগর, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৭

[৩৩] তদৃশ, পৃ. ১৮

[৩৪] তদৃশ, পৃ. ১৮

আন্দোলনের দিশা এবং প্রকৃতি অন্যরকম হতো। যাই হোক, উপর্যুক্ত আলোচনার সাপেক্ষে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে তাহলে বিধবাবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগর নতুন কী করলেন?

আসলে বিদ্যাসাগরের পূর্বে বিধবাবিবাহসংক্রান্ত যাবতীয় প্রচেষ্টা শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক স্তরেই আবর্তিত হয়েছিল। অর্থাৎ, বিষয়টি সমাজের বৃহত্তর মানসে তখনো পর্যন্ত কোনো অনুরণন তোলে নি। বিদ্যাসাগর সুস্পষ্টভাবে একে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেন। বিধবাবিবাহের বিষয়টিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যেটি সেটি অবশ্যই তাঁর রচনা "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব"। আধুনিক যে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করি, তাহলে এই রচনাকে নিঃসন্দেহে একটি ইস্তাহারের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। যে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে আবর্তিত করে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব করে, "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" সেই ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদি সরাসরি আমরা এই রচনাটিকে পড়ি, সে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে যা আমাদের চোখে ধরা পড়বে তা হলো যে বৈধব্যজনিত সমস্যার সমাধান করার অভিপ্রায় নিয়ে বিদ্যাসাগর এই সমস্যার অন্যতম ফল হিসেবে সম্ভ্রান্ত বংশের যে কুলকলঙ্ক, সামাজিক অপমানের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার বিশেষ সমাধানরূপে তিনি বিধবাবিবাহের কথা ভেবেছেন। অর্থাৎ, বৈধব্যযন্ত্রণা থেকে মুক্তির বিষয়টি যে বাঙালি সমাজের ভারসাম্য রক্ষার সমস্যার সঙ্গে যুক্ত, তা কিন্তু এই রচনায় প্রত্যক্ষভাবেই তিনি ধরেছেন। এর অন্য অর্থ করলে দাঁড়ায় যে বাঙালি সমাজে বৈধব্য সমস্যা শুধু নারীর সমস্যা নয়, তা বৃহত্তম সামাজিক সমস্যার দ্যোতক। যখনই একরকম একটি বক্তব্য তিনি এই পুস্তিকাটিতে তুলে ধরলেন, তখনই বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমাজে গতিসঞ্চার করে। যদি বিধবাবিবাহ প্রশ্নের সাথে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের যোগ না থাকত, তাহলে আদৌ এই আন্দোলন গড়ে উঠত কি না, বিষয়টি রীতিমতো ভেবে দেখার মতো। এই কারণেই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সমাজে প্রবল আলোড়ন তৈরি হয়। তখনকার দিনে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হয়ে গেলে বিদ্যাসাগর উৎসাহিত হয়ে আরও 'তিনসহস্র পুস্তক মুদ্রিত' করেন। বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী এরপরে আরও দশ হাজার বই ছাপা হয়।[৩৩] অর্থাৎ নারীর যৌনতা বা সতীত্বের পরিবর্তিত ধারণা, এই সকল পরোক্ষ তাৎপর্যের বিষয়গুলোকে যদি আমরা এড়িয়ে যাই, তাহলেও এটা আমাদের মেনে নিতে হবে যে অন্যান্য যে কোনো সামাজিক আন্দোলনের মতো বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টিকে বিদ্যাসাগর সামাজিক ভাঙাগড়ার সাথে যুক্ত করতে পেরেছিলেন।

আবার সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা রামমোহনের মতোই বিদ্যাসাগর আইনের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে সামাজিক ধ্যানধারণাকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বিধবাবিবাহের বিষয়টিকে প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা হয় নি। বাস্তবতার কঠিপাথরে আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে অজ্ঞতাহেতু সাধারণ মানুষের কাছে শাস্ত্রের অনুমোদন প্রতিপন্ন করে তোলা খুব সহজ কাজ নয়। একে প্রচলিত করতে হলে রাষ্ট্র ও আইনের সমর্থন একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে সতীদাহপ্রথা নিবারণের কথা তাঁর মাথায় নিশ্চয়ই ছিল, যা এক অর্থে আইনের জোরেই বন্ধ হয়েছিল। অতএব তিনি এ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অবতীর্ণ হন। ৯৮৭ জনের স্বাক্ষরসম্বলিত একটি আবেদনপত্র ৪ঠা অক্টোবর ১৮৫৫ সালে তিনি ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠান। ১৭ নভেম্বর ১৮৫৫ ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করার জন্য ওই সভার অন্যতম সদস্য জে. পি. গ্রান্ট বিধবাবিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপির এক

[৩৩] বিদ্যারত্ন, শম্ভুচন্দ্র (১৯৬২) বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, কলকাতা, পৃ. ১১০

খসড়া প্রস্তুত করেন। প্রস্তাবিত বিলের পক্ষে এবং বিপক্ষে অসংখ্য আবেদন জমা পড়তে থাকে। বিদ্যাসাগরের আবেদনটি প্রেরিত হওয়ার পরে বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব আবেদন প্রেরিত হয়, তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষ্ণনগরের অধিবাসীদের আবেদন। সেটি প্রেরিত হয়েছিল পয়লা ডিসেম্বর ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে।[৩৩] বিধবাবিবাহের পক্ষে কৃষ্ণনগরের অধিবাসীদের আবেদন তাৎপর্যপূর্ণ এই অর্থে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের বিধবাবিবাহ প্রচলনের উদ্যোগের বিরোধিতা করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে সংস্কারমুক্ত ও উদারমনা মহারাজা শ্রীশচন্দ্র ১৮৪০-এর দশকে স্বয়ং বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। এরপর বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত পুস্তিকা প্রকাশিত হলে কালীকৃষ্ণ মিত্র কৃষ্ণনগরে এক সভায় প্রবন্ধ পাঠ করে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও বিদ্যাসাগর প্রদত্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলোর বৈধতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। ফলে নতুন করে কৃষ্ণনগরে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।[৩৪] এরই ফলে ১ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখে বিধবাবিবাহের সমর্থনে ওই আবেদনপত্র। যাই হোক নির্বাচন সমিতি প্রস্তাবিত আইনটি সমর্থন করে ৩১ মে ১৮৫৬-য় তাঁদের মন্তব্য পাঠান। ১৯ জুলাই ১৮৫৬-য় আইনের পাণ্ডুলিপিটি তৃতীয়বার পঠিত হওয়ার পর গৃহীত হয়। গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লাভ করার পরে ২৬ জুলাই ১৮৫৬ তারিখে বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়। এই আইন প্রণয়নে বিদ্যাসাগর ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন জে. পি. গ্রান্ট। আইন প্রণীত হওয়ার পরে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ গ্রান্টকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।[৩৮]

৩.

সতীদাহ ও বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মধ্যে সব থেকে বড় প্রভেদ বোধহয় তার ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্যে নিহিত। আইন প্রণয়নের কয়েক বছরের মধ্যেই সতীদাহপ্রথা সমাজ থেকে প্রায় নির্মূল হয়ে যায়। অথচ আইন পাস হওয়ার পরে লক্ষ লক্ষ বিধবার মধ্যে গোটা উনিশ শতকে একশটি পুনর্বিবাহ হয়েছিল কি না সন্দেহ। বিহারীলাল সরকার লিখছেন, "আইন পাশ হইবার পর ৬০/৭০টি মাত্র বিধবাবিবাহ হইয়াছে।" তিনি আরও লিখছেন, "বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া হিন্দুসমাজে স্বীকৃত হয় নাই।"[৩৯] এখানে অনেকে মনে করেন যে সতীপ্রথা আইনের মাধ্যমে বন্ধ করা সহজ হয়েছিল কেননা তা ছিল নিবর্তনমূলক আইন, যা লঙ্ঘন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপরপক্ষে বিধবাবিবাহ আইনটি ছিল সমর্থনসূচক, যা না করলে শাস্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ বিধবাবিবাহ একান্তভাবেই ছিল ব্যক্তির ইচ্ছাসাপেক্ষ। ফলে নিবর্তনমূলক আইন যত সহজে সাফল্য লাভ করে, যে কোনো সমর্থনসূচক আইন ততটাই কঠিন সমাজে জনপ্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে।[৪০] কিন্তু আইনের প্রকৃতির কথা বাদ দিলে এই ব্যর্থতার দিকটি ছিল আরও অনেক গভীরে প্রোথিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ১৮৫৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাধাকান্তদেবের বাড়িতে উপস্থিত থেকে যে ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন এবং মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত' এমন ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর যখন এই বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন তখন এঁরা তার বিরোধিতা করেন।[৪১] অর্থাৎ তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এই বিষয়ে সহমত পোষণ করলেও

[৩৩] বসু, স্বপন (২০০০), বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৪০-১৪১

[৩৪] তদৃশ, পৃ. ১৩৪

[৩৮] তদৃশ, পৃ. ১৪৩-১৪৪

[৩৯] তদৃশ, পৃ. ১৪৬

[৪০] চক্রবর্তী, রমাকান্ত (২০০৩), 'তিন সংস্কারক (রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ)', পৃ. ১৬৯

[৪১] বসু, স্বপন (২০০০), বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পৃ. ১৩৫

কার্যক্ষেত্রে তাদের বেশিরভাগ বিরোধিতা করেছিলেন। এই স্ববিরোধিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বোধহয় স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতারূপে সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুর দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ করার সংবাদ পেয়ে তাঁকে লিখেছিলেন, "এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।"[৪২] ফলে স্বাভাবিকভাবেই এখানে যে প্রশ্নটি ওঠে তা হলো, বিধবাবিবাহ আন্দোলনের এই ব্যর্থতার জন্য আদৌ বিদ্যাসাগর নিজে দায়ী ছিলেন নাকি তাঁর সমসাময়িক বাস্তব অবস্থা এমনই ছিল যেখানে এই ধরনের আন্দোলনের ভবিতব্যই ছিল এই ব্যর্থতা?

ব্যর্থতার দায় বিদ্যাসাগরের কতটা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সামাজিকভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হওয়া বিবাহ সংস্কারের একটি অন্যতম অংশ। স্বয়ং বিদ্যাসাগর বিবাহ সংস্কারের অংশস্বরূপ আরো দুটি আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং একটি ক্ষেত্রে তিনি তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সমসাময়িক বাংলার সংস্কার আন্দোলনের পরিসরের মধ্যে বিধবাবিবাহের পাশাপাশি আরও যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল তা হলো বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ। বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সালে বাল্যবিবাহের প্রশ্নকে সামনে রেখেই তাঁর সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। ১৮৫০ সালে সর্বশুভকরী পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৪৩] এই প্রবন্ধের যেটি বিশেষত্ব তা হলো যে বিধবাবিবাহের মতো কোনো শাস্ত্রীয় যুক্তিকে অনুসরণ না করে বিদ্যাসাগর মানবিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর দাঁড়িয়ে বাল্যবিবাহের সমালোচনা করেছিলেন এবং তার প্রতিকারের পক্ষে সওয়াল করেন। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে পরবর্তীকালে তিনি এই বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো পুস্তিকা বা প্রবন্ধ রচনা করেন নি, এমনকি কোনো আন্দোলনও গড়ে তোলেন নি। আবার তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পরবর্তী ধাপে বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এখানে যেটা ভেবে দেখার তা হলো সমাজে বিধবার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান হেতু ছিল বাল্যবিবাহ এবং কুলীন বহুবিবাহ। এই দুটি সামাজিক প্রথাকে মোকাবিলা না করে তিনি বিধবাবিবাহের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তাঁর প্রভাব যে সীমিত হবে তা সম্ভবত বিদ্যাসাগর বুঝে উঠতে পারেন নি।[৪৪] যদি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন তিনি পূর্বেই সংঘটিত করতেন তাহলে দেখা যেত যে শেষপর্যন্ত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন আর থাকছে না। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের অস্তিত্ব থাকায় বিষবৃক্ষের সূর্যমুখীর মতো অনেকের মনে হয়েছে যে এখন থেকে তাঁদের স্বামীরা শুধু কুমারী মেয়েদের নয়, ইচ্ছে করলে পছন্দসই অনেক বিধবাকেও বিয়ে করতে পারবে। অর্থাৎ বিধবাবিবাহের প্রবর্তন করে বিদ্যাসাগর সূর্যমুখীর মতো স্বামীসর্বস্ব নারীর জীবনে সতীনজ্বালাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহের বাইরে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেভাবে শাস্ত্রীয় সমর্থনকে ব্যবহার করেছিলেন তা পরবর্তীকালে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্ম দেয়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে তাঁর সমস্ত সংস্কার প্রচেষ্টাকে, তা সে নারীশিক্ষা হোক কিংবা বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন, শাস্ত্রীয় অনুমোদনের ভিত্তিতে পরিচালিত করেছিলেন। যেখানে শাস্ত্রীয় সমর্থনের সুযোগ নেই, সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা বা তাকে সমর্থন করা থেকে বিরত ছিলেন। এর ফল কিন্তু শেষপর্যন্ত শুভ হয় নি। শাস্ত্রীয় অনুমোদন সবদিক থেকে অনুকূল না হওয়ায় বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার দাবি তুলতে পারেন নি। শুধু সংখ্যাগত নিয়ন্ত্রণের কথা বলেই তাকে নিবৃত্ত থাকতে হয়েছিল। এমনকি

[৪২] তদ্‌শ, পৃ. ১৩৬

[৪৩] বসু, স্বপন (১৯৯৩), সমকালে বিদ্যাসাগর, পৃ. ০৩

[৪৪] বসু, স্বপন (২০০০), বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পৃ. ১৪৭

শাস্ত্রীয় অনুমোদন না থাকায় পরবর্তীকালে ১৮৯১ সালে প্রস্তাবিত সম্মতি আইনকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের ব্যবহার শেষপর্যন্ত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এবং পুনর্ব্যাখ্যার এক জটিল আবর্তের জন্ম দেয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় অনুমোদনের বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে বিদ্যাসাগরবিরোধী সমালোচকেরা মূলত সেই শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাকেই হাতিয়ার করেছিলেন। এই সকল বিদ্যাসাগরবিরোধী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ক্রমশ জোরালোভাবে এই মত প্রচার করেন যে বিদ্যাসাগর নিজের মত সমর্থনের জন্য অনেক শাস্ত্রের প্রকৃতপাঠ পরিবর্তন করেছেন।[৪৮] এমনকি পরাশর সংহিতা, যার উপর ভিত্তি করে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের যুক্তি হাজির করেছিলেন, তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং শাস্ত্রীয় বিচারে পরাশর সংহিতা কতখানি যথোপযুক্ত তা নিয়েও সন্দেহ ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু সামাজিক আন্দোলনরূপে বিধবাবিবাহের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রের ভূমিকা ছিল বোধহয় সর্বাধিক হতাশাব্যঞ্জক। সাধারণ মানুষের শাস্ত্রবিষয়ক অজ্ঞতার যে পরিস্থিতির দরুন বিদ্যাসাগর আইনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন, দেখা গেল সেখানে আরও বড় বাধারূপে অবস্থান করছে দেশাচার। এই দেশাচার এতই প্রবল যে তা শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রণীত আইনের তুলনায় অনেক বেশি প্রভাবসম্পন্ন। সাধারণ মানুষ এই দেশাচারকেই মেনে চলে এবং তাকেই ধর্মীয় অনুশাসনের মতো করে মর্যাদা দেয়। যেহেতু দেশীয় আচরণের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ দীর্ঘকাল অপ্রচলিত ছিল, ফলে আইনের দ্বারা এবং শাস্ত্রীয় সমর্থনের জোরে তাকে সমাজে পুনর্বার প্রচলন করা সেভাবে সম্ভব হলো না।[৪৯] বিধবাবিবাহ আন্দোলন সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচলিত দেশাচারকে উৎপাটিত করা। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নি। বিদ্যাসাগর যদি শাস্ত্রীয় পথে সংস্কারের প্রচেষ্টা না করে ইয়ংবেঙ্গলের মতো কোনো শাস্ত্রের দোহাই না পেরে আমূল পরিবর্তনের কর্মসূচি গ্রহণ করতেন, তাহলে হয়ত দেশাচার এবং অন্যান্য সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করলেও করা যেত।

অনস্বীকার্য যে, ব্যর্থতার দায় বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি তাঁর সময় এবং পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিমণ্ডলের ওপর প্রায় সমানভাবেই বর্তায়। আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ১৮৫৭-র পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষেত্রে যেমন প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে, তেমনি বাংলার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে। উনিশ শতকের ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে পুনরুত্থানবাদের লক্ষণ স্পষ্ট হতে শুরু করে এবং সত্তরের দশকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে জন্ম হয় সে ক্ষেত্রে এই হিন্দু পুনরুত্থানবাদ সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংস্কার আন্দোলনের দিক থেকে বিচার করলে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ এবং তার সূত্র ধরে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। হিন্দু পুনরুত্থানবাদ জাতীয় চেতনা, তার ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরে সংস্কার আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে এমন একটি ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করে, যার উদ্দেশ্য জাতি হিসেবে ভারতীয়দের নিজস্বতাকে খর্ব করা। অর্থাৎ বিধবাবিবাহের মতো আন্দোলন জাতীয় ঐতিহ্যের পক্ষে নেতিবাচক, কেননা তা ঔপনিবেশিক শক্তির মদদপুষ্ট। সব থেকে বড়

---

[৪৮] বসু, স্বপন (১৯৯৩), সমকালে বিদ্যাসাগর, পৃ. ৫১

[৪৯] সামগ্রিকভাবে সংস্কার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশাচার বা Custom-এর ভূমিকার সবিস্তার উল্লেখ করেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিদ্যাসাগর যখন বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন শুরু করেন, তার প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়ভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, আইনের মাধ্যমে এই ধরনের সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করা প্রায় অসম্ভব। এর কারণ হিসেবে বলেছিলেন যে, আইন যে শাস্ত্রীয় অনুমোদনের ভিত্তিতে রচিত, সমাজের অধিকাংশ মানুষ সেই শাস্ত্র বোঝে না, তাঁরা বোঝে দেশাচার। এই দেশাচারের উপর নির্ভর করেই তাঁরা তাদের জীবন চালান। সুতরাং প্রচলিত আইনের স্থানে চেতনার ক্রমবৃদ্ধির মধ্য দিয়েই এই ধরনের দেশাচারের মোকাবিলা করা সম্ভব। অর্থাৎ বঙ্কিমের মতে সামাজিক সচেতনতা এই ধরনের সংস্কারের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিষেধক।

কথা হলো, এই সময় থেকেই পুনরুত্থানবাদের ঝোঁকে দেশীয় ভারতীয়দের সামাজিক বিষয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির যে কোনো হস্তক্ষেপকেই, তা সে যত মহৎ উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, বিরোধিতা করা হতে লাগল।[৪৭] ১৮৯১ সালে সম্মতি আইনের যে বিরোধিতা হয় তার মূল বক্তব্যটি ছিল এই যে, সামাজিক বিষয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির আইন দ্বারা হস্তক্ষেপ কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা তা ভারতীয়দের জাতি গরিমাকে আঘাত করবে।[৪৮] শাস্ত্রীয় সমর্থনের অভাবের পাশাপাশি হিন্দু পুনরুত্থানবাদী জাতীয়তাবাদের এই অবস্থান ছিল অন্যতম প্রধান কারণ, যার ফলে এ ক্ষেত্রে আইনের প্রস্তাবকে বিদ্যাসাগর শেষপর্যন্ত সমর্থন করতে পারেন নি। হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারা পরবর্তী সময়ে সংস্কার আন্দোলনের ঐতিহ্যকে শেষপর্যন্ত আত্মসাৎ করে। এই জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করেন তা হলো "কোনো জাতির মহত্ত্ব কয়জন বিধবার বিয়ে হল তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না।"[৪৯] হিন্দু জাতীয়তাবাদের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তারূপে তাঁর এই মন্তব্য বুঝিয়ে দেয় বিধবাবিবাহের মতো সংস্কার আন্দোলন, যার মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর অবস্থানকে একটু তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, সেই সময়ে কতটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এমনকি যে আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, জাতীয়তাবাদের এই প্রাবল্য তাকে সেই আধুনিকতার অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে রক্ষণশীলতার আবহে জাতীয়তাবাদের মোড়কে মুড়ে ফেলার প্রচেষ্টা করে। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, ইংরেজ শাসকদের উন্নাসিক ব্যবহারের প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ প্রভৃতি ঘটনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৫০] কিন্তু তাঁর সর্বপ্রধান কার্য বিধবাবিবাহ আন্দোলন বা অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। যেখানে আধুনিক মননের বিদ্যাসাগরকে জাতীয়তাবাদীরূপে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চলে, সেখানে বিধবাবিবাহের মতো সামাজিক আন্দোলন যে আপনা থেকেই তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে সেটাই বোধহয় ছিল স্বাভাবিক।

৪.

অথচ ঔপনিবেশিক আধুনিকতা থেকে জাতীয়তাবাদ– যে কোনো ঔপনিবেশিক সমাজের ক্ষেত্রে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের বিচারে কাঙ্ক্ষিত যাত্রাপথ হিসেবেই পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকে বাংলার সংস্কার আন্দোলন হলো আধুনিকতার সেই পর্যায়, যাকে অতিক্রম করে ঊনবিংশ শতকের সত্তরের দশক থেকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভাবধারার আবির্ভাব সংস্কার আন্দোলনের ধারাকে রুদ্ধ করে তাকে যেভাবে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে, সেখানে বিধবাবিবাহের মতো কর্মসূচির প্রকৃত সামর্থ্য ও অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নিতান্ত স্বাভাবিক। আমরা জানি যে উনিশ শতক জুড়ে যে সকল সংস্কার প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছিল, তার সিংহভাগই ছিল নারীকেন্দ্রিক। অতএব জাতীয়তাবাদী যুগে এই আন্দোলনে ভাটা পড়ার অর্থ হলো নারী স্বাধীনতা এবং সমাজে নারীর সামাজিক উন্নয়নজনিত সব ধরনের উদ্যোগ-আয়োজনের পরিসমাপ্তি। এখানে একটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, সেটি হলো উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরসহ অন্য সংস্কারকগণ নারী সমস্যাকে এতখানি গুরুত্ব দিলেন কেন? সেই সময়ে

---

[৪৭] চ্যাটার্জি, পার্থ (১৯৮৯) "দ্য ন্যাশনালিস্ট রেজ্যুলেশন অফ দ্য ওমেন'স কোশ্চেয়েন" সাঙ্খরি, কুমকুম ও বেদ, সুরেশ (সম্পাদিত) রিকাস্টিং ওমেন : এসেজ ইন কলোনিয়াল হিস্ট্রি, কালী ফর ওমেন, নিউ দিল্লি, পৃ. ২৩৮

[৪৮] সরকার, সুমিত (২০০২), বিয়ন্ড ন্যাশনালিস্ট ফ্রেম : রিলোকেটিং পোস্টমর্ডানিজম, হিন্দুত্ব, হিস্ট্রি, পার্মানেন্ট ব্ল্যাক, নিউ দিল্লি, পৃ. ১১৪

[৪৯] নাথ, রাখাল চন্দ্র (১৯৯৮), ভাব, সংঘাত ও সমন্বয়, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃ. xviii

[৫০] সরকার, সুমিত (১৯৯৮), রাইটিং সোশ্যাল হিস্ট্রি, পৃ. ২৫০-২৫১

নারীর মতোই আরও অনেক দুর্বল শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল, অথচ সংস্কারকগণ মূলত মাথা ঘামালেন নারীকে নিয়ে। কিন্তু কেন? নারীবাদী অবস্থান থেকে এমন প্রশ্নকে অবশ্যই নারীবিরোধী অবস্থান বলে আখ্যায়িত করা যায়। যেহেতু সমাজের অর্ধেক অংশ নারী, সেহেতু সংস্কারকগণ কেন তাদের প্রাধান্য দিলেন সেই প্রশ্ন তোলা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। তবু বিদ্যাসাগর এবং তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দোলন প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ কেননা ব্যক্তি যেমন একক সত্তা নয়, তার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে জাতিগত ও শ্রেণিগত পরিচয়, তেমনি উনিশ শতকের বাঙালি নারীকে বিচার করতে গেলে তাকে তার জাতিগত ও শ্রেণিগত প্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে আলোচনা করা বোধহয় সম্ভব নয়। একবার এই বাঙালি নারীকে যদি তার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে দেখতে শুরু করি, তাহলে তাদের মধ্যে সমস্যার ভিন্নতা, অবস্থানের পার্থক্য আমরা লক্ষ করব। এই ভিন্নতার জায়গা থেকেই তখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে কেন নারী সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রে অবস্থান করেছিল? এর সঙ্গে আরও যে প্রশ্নটি পাশাপাশি উঠে আসে সেটি হলো সংস্কার আন্দোলন যে নারীর কথা তুলে ধরেছিল তারা কি সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব করে নাকি বিশেষ বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর নারীই ছিলেন সংস্কারকদের মূল লক্ষ্য?

উত্তর খুঁজতে আমাদের আরও একবার ফিরে যেতে হবে "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তিকাটিতে, যা বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালে রচনা করেছিলেন। এখানে উল্লিখিত অংশে আমরা দেখি যে বৈধব্যজনিত ব্যভিচার এবং অমঙ্গলের সঙ্গে বিদ্যাসাগর পারিবারিক তথা কুলসম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার বিষয়টিকে যুক্ত করেছেন। বিধবাবিবাহ হলো এই সকল ক্ষেত্রে কুলসম্মান রক্ষা করবার একটি প্রতিষেধক। প্রশ্ন উঠতে পারে তিনি কাদের কুলসম্ভ্রম রক্ষা করার নিমিত্ত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের কথা ভেবেছিলেন? তিনি যে সাধারণ স্তরের মানুষের কুলসম্ভ্রম রক্ষা করার কথা ভেবেছিলেন তা কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ যে কুলীন প্রথার ফলস্বরূপ বৈধব্যজনিত সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, তা ছিল মূলত উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত অংশের মধ্যে প্রচলিত। অর্থাৎ, বৈধব্যজনিত ব্যভিচার এবং কুলসম্মানহানির আশঙ্কা যে এই অংশের মধ্যেই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে সেটাই ছিল ঐতিহাসিক সত্য। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যে নতুন শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে, যারা পরবর্তী সময়ে ভদ্রলোক শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তারাই বিধবাবিবাহসহ নারীসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বিধবাবিবাহ প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনে এই ভদ্রলোক শ্রেণির একটি অংশ সমর্থনকারীর ভূমিকায় তাঁর পাশে দাঁড়ায়। বস্তুত বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ থেকে শুরু করে নারীশিক্ষা, নারীকেন্দ্রিক প্রায় সকল সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও সমর্থনের ক্ষেত্রে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির একটি অংশ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু শুধু পারিবারিক মানসম্মান বা আভিজাত্য রক্ষার জন্যই যে ভদ্রলোক শ্রেণি বিধবাবিবাহসহ অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল, উদ্দেশ্যটা আবার এতটা সীমাবদ্ধ ছিল না। এর অন্য উদ্দেশ্য এবং অবশ্যই ঐতিহাসিকভাবে বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মানদণ্ডে ভদ্রসমাজের নারীর এমন একটি ভাবমূর্তি নির্মাণ করা, যার মধ্য দিয়ে ভদ্রলোক শ্রেণি নিজেকে সমাজে উন্নত এবং অগ্রসর অংশরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নারীশিক্ষা, যেখানে বিদ্যাসাগর এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা বাঙালি ভদ্রমহিলার নতুন উন্নত ভাবমূর্তি গড়ে তোলার প্রেক্ষিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি কুলীন বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের অভিশাপে সম্ভ্রান্ত ভদ্রশ্রেণির মহিলাকে সারাজীবন দুঃসহ বৈধব্যের যন্ত্রণা সইতে হয় যা যৌন ব্যভিচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার নতুন উন্নত ভাবমূর্তি কখনোই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ভদ্রলোক শ্রেণির কাছে পারিবারিক সম্মান রক্ষার পাশাপাশি বিধবাবিবাহ আন্দোলনসহ সামগ্রিকভাবে সংস্কার আন্দোলন

এমন একটি সামাজিক প্রকল্পের অংশ, যার উদ্দেশ্য ভদ্রশ্রেণির মহিলাদের এক নতুন ইমেজ গড়ে তোলা। যাঁরা উন্নত অগ্রসর সামাজিক শ্রেণির মর্যাদাকে প্রতিফলিত করবে।[৩]

তাহলে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন কি শেষ বিচারে ভদ্রশ্রেণির নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছিল? আসলে বিদ্যাসাগর হয়ত সচেতনভাবে এই ধরনের কোনো প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে চান নি। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবং ইতিহাসের নির্দিষ্ট যাত্রাপথে বিদ্যাসাগর ভদ্রলোক শ্রেণির এই বৃহত্তর সামাজিক প্রকল্পের মুখপত্রে পরিণত হন। ১৮৭০ সালের পর যখন এই ভদ্রলোক শ্রেণি ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ভাবধারাকে পরিত্যাগ করে ক্রমশ হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন এই আধুনিক বাঙালি নারীর ভাবমূর্তি জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তখন থেকে ভদ্রশ্রেণির মহিলাকে হাজির করা হয় জাতীয় মর্যাদার প্রতীকরূপে, যেখানে তাকে মহান জাতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষক এবং প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[৪] এরপর স্বভাবতই সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং আইনের দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন সাধনের মতো বিষয়গুলোর আর কোনো গুরুত্ব এই শ্রেণির কাছে থাকল না। এখানে আরও একবার যে সত্যটি উঠে আসে তা হলো, বাঙালি সমাজে ১৮৭০ সালের পরবর্তী সময়ে ভদ্রলোক শ্রেণির মানসিকতায় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা কিন্তু বিদ্যাসাগরকেও প্রভাবিত করেছিল এবং সামাজিক সংস্কার আন্দোলন বিষয়ে ধীরে ধীরে তিনিও ভিন্ন অবস্থান নিতে শুরু করেছিলেন। ১৮৯১ সালে তিনি যখন সম্মতি আইনের বিরোধিতা করেন, তার পেছনে ভদ্রলোক শ্রেণির এই পরিবর্তিত অবস্থান এক গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করেছিল, এমনটা মনে করার বেশ সংগত কারণ আছে। বিদ্যাসাগরের যে বিধবাবিবাহ আন্দোলন এক প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়ন তুলেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সেই ব্যর্থতার নেপথ্যে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি প্রধান সামাজিক শ্রেণিরূপে ভদ্রলোক শ্রেণির মানসিকতা এবং শ্রেণিস্বার্থ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যেহেতু এই শ্রেণির সমর্থনের উপর দাঁড়িয়েই বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে পরিচালনা করেছিলেন, ফলে এই শ্রেণি যখন এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেল, আন্দোলন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল।

এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও প্রতিটি আন্দোলন পরোক্ষভাবে এমন কিছু দিককে তুলে ধরে, যার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যেভাবে সতীত্বের নতুন ধারণা এবং নারীর যৌনতাকে পরোক্ষে তুলে ধরেছিলেন তা একভাবে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের এক অনালোচিত অধ্যায়। বিদ্যাসাগরের দুইশততম জন্মবার্ষিকীতে এই অনালোচিত বিষয়কে যদি আমাদের চিন্তাভাবনা ও আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপন করতে পারি, তাহলে সেটাই হবে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বের প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠতম শ্রদ্ধার্ঘ্য।

শেখর শীল সংযুক্ত অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। silsekhar600@gmail.com

[৩] ফোবস্, জেরালডাইন (১৯৯৮), ওমেন ইন মডার্ন ইন্ডিয়া, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লি, পৃ. ১৫

[৪] চ্যাটার্জি, পার্থ (১৯৮৯), 'দ্য ন্যাশনালিস্ট রেজ্যুলেশন অফ দ্য ওমেন'স কোয়েশ্চেন', পৃ. ২৩৮-২৩৯